IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

ন্যায় দর্শনের আলোকে মোক্ষের ধারণা

ড. অঞ্জন কুমার মন্ডল
সহকারী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
গভর্ণমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ লালগড়
ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

In Indian philosophy, Nyāya philosophy is known as Mokṣha-oriented philosophy. In Nyāya philosophy, the word Mokṣha is used in the sense of apavarga or nihśreyasa. According to Nyāya, Mokṣha or liberation is the ultimate goal. The main purpose of Nyāya philosophy is to guide the right path to attain this ultimate goal of Mokṣha through epistemological and theoretical discussions. A total of sixteen padarthas are mentioned in Nyāya philosophy. According to Maharshi Gautama, only if one has the tattvajnana of these sixteen padārthas can attain the nihśreyasa or the supreme puruṣārtha apavarga. The main obstacle to attaining apavarga is suffering. And this suffering comes from false knowledge. Therefore, when false knowledge is destroyed, suffering ends, and only when suffering ends is liberation possible. That is, to attain liberation, we first need to destroy false knowledge. Only through knowledge of truth can the destruction of false knowledge be possible. When the knowledge of the truth is attained, the previously accumulated karma of the living being is destroyed and new karma is no longer produced. That is, the enjoyment of destiny of the living being is inevitably destroyed. When the enjoyment of destiny of the living being is destroyed and the karma is not produced, the rebirth of the living being is naturally prevented. If there is no rebirth, the ultimate cessation of suffering occurs. And only when suffering is completely eliminated does one attain Mokṣha or apavarga.

Keywords: Mokṣha, Apabarga, Nihśreyasa Duhkha, Puruṣārtha.

ভারতীয় দর্শন মূলত অধ্যাত্মবাদী দর্শন। অধ্যাত্মবাদ বলতে সেই মতবাদকে বোঝায়, যে মতবাদে স্থুল জড়ের অতিরিক্ত চেতন সত্তাকে স্বীকার করা হয়, জন্মবাদ ও কর্মবাদে বিশ্বাস করা হয়, আধ্যাত্মিক সুখকেই পরম কাম্যবস্তু রূপে বিবেচনা করা হয় এবং মোক্ষ বা মুক্তিকে জীবনের পরম পুরুষার্থরূপে গ্রহণ করা হয়। এই অর্থে চার্বাক ব্যতীত অপরাপর সকল ভারতীয় দর্শন এমনকি জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও এদের অধ্যাত্মবাদী বলা যায়। অধ্যাত্মবাদী হওয়ার কারণে এই সকল দর্শন সম্প্রদায়েরই চরম ও পরম লক্ষ্য হল মোক্ষ প্রাপ্তি। যদিও মোক্ষের স্বরূপ ও মোক্ষ লাভের উপায় বিষয়ে সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে।

সাধারণত ভারতীয় দর্শনে দেখা যায় মানুষের নানা প্রয়োজনের মধ্যে চারটি মূখ্য প্রয়োজন থাকে— ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এগুলি পুরুষার্থ নামেই পরিচিত। এ বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণেও বলা আছে-

"ধর্মার্থাকামমোক্ষশ্চ পুরুষার্থা উদাহৃতাঃ।"[১] (বিষ্ণুপুরাণ, ১/১৮/২১.১)

অর্থাৎ, পুরুষার্থ হিসাবে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ স্বীকার্য। তবে এই চারটি পুরুষার্থকেই সকল ভারতীয় দর্শনে মূখ্য পুরুষার্থের স্থান দেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায় বিভিন্ন মত দিয়ে থাকেন । এই চারটি পুরুষার্থকে মূখ্য বলে গ্রহণ না করলেও সকল অধ্যাত্মবাদী ভারতীয় দর্শনেই এই চারটি পুরুষার্থের অন্যতম মোক্ষ বা মুক্তিকে পরম পুরুষার্থরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। একারণে ধর্ম, অর্থ ও কামকে বলা হয় 'অল্পক', আর মোক্ষকে বলা হয় 'মহৎ'।[২] অর্থাৎ সকল অধ্যাত্মবাদী ভারতীয় দর্শনের মূল লক্ষ্যই হল মোক্ষপ্রাপ্তি।

এখন প্রশ্ন হল 'মোক্ষ' বা 'মুক্তি' বলতে কি বোঝায়? সাধারণত আমরা 'মোক্ষ' কথাটিকে বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পাই। বৌদ্ধ দর্শনে 'মোক্ষ' কথাটি 'নির্বাণ' অর্থে ব্যবহৃত হয়। বৌদ্ধমতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হল 'নির্বাণ'। জৈন দর্শনে 'মোক্ষ' কথাটি 'কৈবল্য' অর্থে ব্যবহার করা হয়। জৈন মতে আত্মা থেকে কর্মপুদ্‌গল নাশ হলে মোক্ষলাভ সম্ভব হয়। ন্যায় মতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হল মোক্ষ। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা এই মোক্ষলাভ সম্ভব হয়। সাংখ্য ও যোগ দর্শনে মোক্ষ বলতে আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক — এই তিনপ্রকার দুঃখের অভাবকেই বোঝানো হয়। মীমাংসা দর্শনে দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশকেই মোক্ষ বলা হয়। আবার বেদান্ত দর্শনে বলা হয়, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার হলে জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। এই ব্রহ্মপ্রাপ্তিই মোক্ষ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মোক্ষের স্বরূপ বিষয়ে ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে কোনো ঐক্যমত পাওয়া যায় না। বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায় বিভিন্ন ভাবে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবে মোক্ষের স্বরূপ সম্পর্কে ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মতভেদ থাকলেও একটি দিক থেকে এরা সকলেই একমত পোষণ করেন। মোক্ষবাদী সকল দার্শনিকই মনে করেন যে মোক্ষ হল 'আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি' বা 'চিরকালের জন্য দুঃখ থেকে মুক্তি'। অর্থাৎ মোক্ষলাভ হলে আর জন্মগ্রহণ করে কামনা-বাসনার দ্বারা তাড়িত হয়ে দুঃখ ভোগ করতে হয় না।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে ন্যায় দর্শন মোক্ষবাদী দর্শন হিসাবেই পরিচিত। ন্যায় দর্শনে 'মোক্ষ' কথাটি অপবর্গ বা নিঃশ্রেয়স অর্থে ব্যবহৃত হয়। ন্যায় মতে মোক্ষ বা মুক্তিই হল পরম পুরুষার্থ। জ্ঞানতাত্ত্বিক এবং তত্ত্বসংক্রান্ত আলোচনার মাধ্যমে এই পরম পুরুষার্থ মোক্ষলাভের সঠিক পথনির্দেশ করাই ন্যায়শাস্ত্রের মূখ্য উদ্দেশ্য। ন্যায় শাস্ত্রে মোট ষোলটি পদার্থের উল্লেখ করা হয়েছে। মহর্ষি গৌতমের মতে, এই ষোলটি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হলে তবেই নিঃশ্রেয়স বা পরম পুরুষার্থ অপবর্গ লাভ সম্ভব হয়। এজন্যই মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্রের প্রথম সুত্রে বলেছেন,

"প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-

বাদ-জল্প-বিতন্ডা-হেত্বাভাসচ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং

তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।"[৩]

এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি গৌতম প্রমাণ, প্রমেয়াদি ষোড়শ পদার্থের উল্লেখপূর্বক এই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই যে নিঃশ্রেয়স লাভের উপযোগী, তা ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হলে নিঃশ্রেয়স বা মুক্তিলাভ হয়। এই সূত্রটির দ্বারা আর একটি বিষয় পরিস্ফুট হয় যে, উক্ত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থ হল ন্যায়শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়, আর নিঃশ্রেয়স হল এর প্রয়োজন।

এই 'নিঃশ্রেয়স' শব্দের অর্থ কী? সাধারণত ন্যায়শাস্ত্রে 'নিঃশ্রেয়স' শব্দটি মুক্তি বা অপবর্গ অর্থেই প্রযুক্ত হয়। একারণে পাণিনীয় ব্যাকরণে বলা হয়েছে- "নিশ্চিতং শ্রেয়ো নিঃশ্রেয়সং।" অর্থাৎ মুক্তিই নিশ্চিত শ্রেয়ঃ। কিন্তু এই নিঃশ্রেয়স শব্দটি সর্বত্রই মুক্তি অর্থে প্রযোজ্য হয় না। এর আরও কতগুলি অর্থ রয়েছে। যেমন ভাগবদ্ গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় সূত্রে বলা হয়েছে-

"সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।"[৪]

অর্থাৎ কর্মসন্ন্যাস ও কর্মযোগ উভয়ই কল্যাণকর। এখানে 'নিঃশ্রেয়স' শব্দটি 'কল্যাণ' অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে। আবার নীলকণ্ঠ কৃত টীকায় পরিষ্কারভাবে বলাই আছে, "নিঃশ্রেয়সং কল্যাণম্।" অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স হল কল্যাণ। সুতরাং লক্ষ্য করা যায় মহর্ষি তাঁর প্রথম সূত্রে যে 'নিঃশ্রেয়স' শব্দটি ব্যবহার করেছেন তা কেবল মুক্তি অর্থেই প্রযোজ্য নয়, এটি নিঃশ্রেয়সের অন্যান্য সকল প্রকার অর্থেই প্রযোজ্য। কিন্তু মহর্ষি গৌতম তাঁর দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা একথা স্পষ্ট করেছেন যে, নিঃশ্রেয়স শব্দটি কেবলমাত্র মুক্তি বা অপবর্গ অর্থেই প্রযুক্ত হতে পারে অন্য কোন অর্থে নয়।

এই প্রসঙ্গে 'ন্যায়বার্ত্তিক'কার উদ্দ্যোতকরের মত উল্লেখ করে বলা যায়, নিঃশ্রেয়স দু-প্রকার — দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। প্রমাণ প্রমেয়াদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যে নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, তাকে বলা হয় দৃষ্ট। আর আত্মা-শরীরাদি দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান থেকে যে নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, তাকে বলা হয় অদৃষ্ট। এই অদৃষ্ট নিঃশ্রেয়সকেই ন্যায়দর্শনে বলা হয় চরম নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি।

মহর্ষি তাঁর প্রথম সূত্রে ষোড়শ পদার্থের উল্লেখ করেছেন, সেই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা যে নিঃশ্রেয়স লাভ হয় তাকে এই চরম নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি বলে অভিহিত করা যায় না, তা সর্বপ্রকার নিঃশ্রেয়সের (কল্যাণাদি অন্যান্য যে সকল অর্থে নিঃশ্রেয়স প্রযুক্ত হয়) কারণ বলে অভিহিত হয়। কিন্তু নিঃশ্রেয়স বলতে যাকে মুক্তি বোঝায়, যা ন্যায় দর্শনে স্বীকৃত, সেই চরম নিঃশ্রেয়স কেবলমাত্র আত্মাদি প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান থেকেই লাভ করা যায়। মহর্ষি গৌতম এই প্রমেয় পদার্থের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ন্যায়সূত্রের নবম সূত্রে বলেছেন,

"আত্ম-শরীরেন্দ্রিয়ার্থ-বুদ্ধি-মনঃ-প্রবৃত্তি-দোষ -

প্রেত্যভাব-ফল-দুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্।"[৫]

অর্থাৎ আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ - এই দ্বাদশ প্রকার পদার্থই হল প্রমেয় পদার্থ। ন্যায়মতে এই দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞান হলেই নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ লাভ হয়।

দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের প্রথম পদার্থ হল আত্মা। এখানে আত্মা বলতে জীবাত্মাকে বোঝানো হয়েছে । ন্যায়মতে জীবাত্মার পরম পুরুষার্থ হল 'মোক্ষ' বা 'অপবর্গ'। ন্যায়দর্শনে এই জীবাত্মাকে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা বলা হয়েছে। দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জড় পদার্থ কখনোই জ্ঞান হতে পারে না, তাই জীবাত্মাকেই সকল সুখ-দুঃখ সাধনের জ্ঞান এবং সকল সুখ-দুঃখের ভোক্তা বলতে হয়। অতএব ন্যায় মতানুসারে কেবলমাত্র আত্মারই অপবর্গ বা মোক্ষ লাভ সম্ভব হয়।

মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্র গ্রন্থে প্রমেয় পদার্থের যে বিভাগ দেখিয়েছেন, তার সর্বশেষ পদার্থ রূপে অপবর্গের কথা উল্লেখ করেছেন। পরে তিনি তাঁর গ্রন্থের ২২ নং সূত্রে অপবর্গের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন-

"তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ।"[৬]

উক্ত লক্ষণে 'তদ' শব্দের দ্বারা মহর্ষি জাগতিক সকল প্রকার দুঃখকে গ্রহণ করেছেন। মানুষের জীবনের সকল প্রকার দুঃখ বলতে সাধারণত তিন প্রকারের দুঃখকেই বোঝানো হয় - আধ্যাত্মিক দুঃখ, আধিভৌতিক দুঃখ ও আধিদৈবিক দুঃখ। সুতরাং এই তিন প্রকার দুঃখের অত্যন্ত বিমোক্ষ বা আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হল অপবর্গ।

এখন প্রশ্ন হল, যে দুঃখ আত্মার বন্ধনের কারণ, সেই দুঃখ বলতে কি বোঝায়? সেই দুঃখের কারণ-ই বা কী? মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্রে অপবর্গের লক্ষণ দেওয়ার ঠিক পূর্বেই দুঃখের লক্ষণ দিয়ে বলেছেন-

"বাধনা লক্ষণং দুঃখম্।"[৭]

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এখানে 'বাধনা' বলতে দুঃখ, পীড়া বা তাপকে বুঝিয়েছেন। আর 'লক্ষণ' বলতে অনুষঙ্গরূপ সম্বন্ধ যাতে আছে তাকেই বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ দুঃখের অনুষঙ্গরূপ সম্বন্ধ যাতে থাকে, তাই দুঃখ। এই মতানুসারে বলা যায় দেহ থেকে ফল পর্য্যন্ত নয়টি প্রমেয় পদার্থই দুঃখের দ্বারা অনুষক্ত বলে এর দুঃখ।

এখন আমাদের জানা দরকার এই যে দুঃখ যা মোক্ষলাভের প্রতিবন্ধক, সেই দুঃখের কারণ কী? নৈয়ায়িকরা মনে করেন মিথ্যাজ্ঞানই হল দুঃখের মূল কারণ। সুতরাং আত্মার বন্ধনের মূল কারণ হল মিথ্যাজ্ঞান। বিষয়টিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করে বলা যায় যে-

আত্মার বন্ধনের কারণ হল দুঃখ ।

দুঃখের কারণ হল মিথ্যাজ্ঞান ।

অতএব, মিথ্যাজ্ঞানই হল আত্মার বন্ধনের মূল কারণ ।

সাধারণত যথার্থ জ্ঞানের বিপরীত জ্ঞানকে বলা হয় মিথ্যা জ্ঞান। ন্যায়শাস্ত্রে যথার্থ জ্ঞান বলতে দ্বাদশপ্রমেয় পদার্থের সম্যক্ জ্ঞানকেই বোঝানো হয়ে থাকে। সুতরাং এই দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের জ্ঞানের অভাবকেই বলা হয় মিথ্যা জ্ঞান। আর এই মিথ্যাজ্ঞানই জীবের বন্ধনের কারণ।

নৈয়ায়িকরা মনে করেন মিথ্যাজ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয় ত্রিবিধ দোষ – রাগ, দ্বেষ ও মোহ। এই দোষ থেকে উৎপন্ন হয় প্রবৃত্তি। দোষের বশবর্তী হয়ে জীব তিন ধরনের কর্মে প্রবৃত্ত হয় – বাচনিক কর্ম, মানসিক কর্ম এবং শারীরিক কর্ম। প্রবৃত্তিজনিত এইসব কর্মের ফল হল প্রেত্যভাব বা পুনর্জন্ম। আর পুনর্জন্মের ফলেই জীব দুঃখভোগ করে থাকে। অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান থেকে দুঃখ পর্যন্ত একটি কার্য-কারণ শৃঙ্খল লক্ষ্য করা যায়। মহর্ষি গৌতমকে অনুসরণ করে কার্য-কারণ শৃঙ্খলটিকে[৮] এইভাবে দেখানো যায়-

কারণ	কার্য
মিথ্যাজ্ঞান	দোষ
দোষ	প্রবৃত্তি
প্রবৃত্তি	জন্ম (পুনর্জন্ম)
জন্ম	দুঃখ

অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান থেকে দোষ, দোষ থেকে প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তি থেকে জন্ম এবং জন্ম থেকে দুঃখের উৎপত্তি হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে মিথ্যাজ্ঞানই হল জীবের বদ্ধাবস্থার তথা দুঃখের আদি কারণ।

আমরা জানি কারণের অপায়ে কার্যের অপায় হয়। এখন আমরা যদি কার্য রূপ দুঃখের বিনাশ (অপায়) করতে চাই, তাহলে তার পূর্বে আমাদের কারণ রূপ মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ করতে হবে। সাধারণত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতিকে আমরা মিথ্যাজ্ঞানের প্রভাবে আত্মা বলে মনে করি, যদিও এগুলি আত্মা নয়। এই ধরনের মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ হয় তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা। মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দোষের নিবৃত্তি হয়। দোষের নিবৃত্তি হলে তার কার্য প্রবৃত্তির নাশ হয়। প্রবৃত্তির নাশ হলে জন্মের নিবৃত্তি হয়। আর জন্মের নিবৃত্তি হলে ত্রিবিধ দুঃখের বিনাশ হয়। দুঃখের বিনাশ হলে স্বাভাবিকভাবেই অপবর্গ লাভ হয়। তাই মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্রের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় সূত্রে বলেছেন-

"দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞান-নামুত্তরোত্তরাপায়ে তদন্তরাপায়াপবর্গঃ।"[৯]

অর্থাৎ দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ এবং মিথ্যাজ্ঞানের উত্তরোত্তর অপায় হলে বা নিবৃত্তি হলে অপবর্গ হয়। নৈয়ায়িকগণ বলেন, যতক্ষণ দেহ থাকে, ততক্ষণ আত্মার পক্ষে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। কারণ দেহ থাকলেই ইন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবে, এর ফলে দুঃখ অনিবার্য হয়ে পড়বে। সুতরাং দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারলেই আত্মার মুক্তিলাভ সম্ভব হয়। ন্যায়মতে দেহের সঙ্গে আত্মার সংযোগ হলে চৈতন্যজ্ঞানের আবির্ভাব হয়, কিন্তু আত্মা দেহ থেকে বিযুক্ত হলেই আত্মাতে আর চৈতন্য থাকে না। সুতরাং আত্মা যখন দেহ থেকে বিযুক্ত হয়, তখন তাতে সুখ, দুঃখ ইত্যাদি কোন প্রকার অনুভুতি থাকে না । অর্থাৎ মুক্ত অবস্থায় আত্মা সুখ, দুঃখ বর্জিত দ্রব্য রূপে গণ্য হয়। ন্যায় দর্শনে এইরকম অবস্থা 'অভয়ম্', 'অজরম্', 'অমৃত্যুপদম্' নামে পরিচিত। সুতরাং ন্যায় মতানুসারে দেহ থাকাকালীন কোন মতেই জীব মুক্তি লাভ করতে পারে না। দেহের বিনাশেই জীবের মুক্তি লাভ সম্ভব হয়। অতএব ন্যায় মতে বিদেহ মুক্তি হল প্রকৃত মুক্তি।

এখন প্রশ্ন হল এই মুক্তি বা অপবর্গ লাভের উপায় কী? আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি অপবর্গ লাভের প্রধান প্রতিবন্ধক হল দুঃখ। আর এই দুঃখ আসে মিথ্যাজ্ঞান থেকে। সুতরাং মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ হলে দুঃখের অবসান ঘটে, দুঃখের অবসান হলেই মুক্তিলাভ সম্ভব হয়। অর্থাৎ মোক্ষলাভের জন্য আমাদের প্রথমেই প্রয়োজন মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ করা। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই মিথ্যাজ্ঞানের নাশ সম্ভব হয়। সুতরাং এখন আমাদের জানা দরকার তত্ত্বজ্ঞান কিভাবে লাভ করা যায়?

অপরাপর বৈদিক সম্প্রদায়গুলির মতো নৈয়ায়িকগণও অপবর্গের উপায়রূপ তত্ত্বজ্ঞানের উপায়রূপে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের উল্লেখ করেছেন। প্রথমে শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ প্রয়োজন। শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ করে ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে, আত্মা দেহ নয়, ইন্দ্রিয় নয়, মন নয়; আত্মা এইসব থেকে ভিন্ন এক দ্রব্য। শাস্ত্রবাক্য শ্রবণের পর সেইসব বাক্যের যুক্তিপূর্ণ বিচার, সঠিক অর্থ গ্রহণ এবং ঐ

অর্থের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন হল মনন। আর যোগ ও সাধনার মাধ্যমে আত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎকার হল নিদিধ্যাসন। এই তিনটি স্তরের মাধ্যমে আমাদের দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত এক শুদ্ধ আত্মার উপলব্ধি ঘটে। এই আত্মোপলব্ধিই হল তত্ত্বজ্ঞান।

এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে জীবের পূর্বে সঞ্চিত কর্মফল বিনষ্ট হয় এবং নতুন কর্মফলও আর উৎপন্ন হয় না। অর্থাৎ অনিবার্যভাবেই জীবের অদৃষ্ট ভোগ বিনষ্ট হয়ে যায়। জীবের অদৃষ্টভোগ বিনষ্ট হলে এবং কর্মফল উৎপন্ন না হলে স্বাভাবিকভাবেই জীবাত্মার পুনর্জন্ম রোধ হয়। পুনর্জন্ম না হলে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে। আর দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হলেই মোক্ষলাভ বা অপবর্গ লাভ হয়।

তথ্যসূত্র

১। স্বামী বিদ্যারণ্য, বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক, ৬ এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা-১৩, ১৯৯৯/বি, পৃ.-১৬৮

২। তদেব, পৃ.-১৬৮

৩। ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ন্যায় দর্শন (প্রথম খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক, ৬ এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা-১৩, ২০১১/এ, পৃ.-১৮

৪। গায়ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায় (অনুবাদিকা), শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ২০০৭, পৃ.-৭০

৫। ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ন্যায় দর্শন (প্রথম খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক, ৬ এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা- ১৩, ২০১১/এ, পৃ.-১৯৫

৬। তদেব, পৃ.-২৩৩

৭। তদেব, পৃ.-২৩ ১

৮। তদেব, পৃ.-৬৬

৯। তদেব, পৃ.-৬৩

গ্রন্থপঞ্জী

১। তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, *ন্যায় দর্শন (প্রথম খন্ড)*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক, ৬ এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা- ১৩, ২০১১/এ

২। তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, *ন্যায় পরিচয়*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক, ৬ এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা- ১৩, ২০০৬/বি

৩। বিদ্যারণ্য, স্বামী, *বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক, ৬ এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা-১৩, ১৯৯৯/বি

৪। ঘোষ, বারিদ বরণ ও বোস, চারুচন্দ্র, *ধম্মপদ*, করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ টেমার লেন,
কলকাতা-০৯

৫। দাস, চন্দনা, *ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিতে মুক্তির স্বরূপ*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ৩৭ এ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, ২০০৬

৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, গায়ত্রী (অনুবাদিকা), *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ২০০৭

৭। সেন, দেবব্রত, ভারতীয় দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক, ৬ এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা- ১৩, ২০১৪/বি

৮। মন্ডল, প্রদ্যোত কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ৩৭ এ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, ২০১০

৯। Chatterjee, S. C. & Dutta, D. M., *An Introduction to Indian Philosophy*, Calcutta University Press, 1948.

১০। Sharma, Chandradhar, *A critical Survey of Indian Philosophy*, Motilal Banarsidass Publishers Private Ltd, Delhi, 2016.